# মধ্যজীবন ও মেনোপজঃ নারী দেহের উপর চিকিৎসা-বিশ্বাসের রাজনীতি

নারীর জীবনের বিভিন্ন পরিবর্তন, বিশেষত মধ্য বয়স এবং মেনোপজের সময়ে, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানী প্রেক্ষাপটে দীর্ঘদিন ধরে বিতর্কের বিষয় হয়ে এসেছে। ১৯শ শতকের মাঝামাঝি থেকে ইউরো-আমেরিকায় চিকিৎসকরা নারীর জীবনের এই পরিবর্তনগুলোকে একটি চিকিৎসাগত প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করতে শুরু করেন, যেখানে শরীরের শারীরিক পরিবর্তনগুলোর উপর চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়। তবে, এসব পরিবর্তন শুধু শারীরিক নয়, বরং এটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া, যা নারীর অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতা এবং সমাজে তার অবস্থানকে প্রভাবিত করে। তবে চিকিৎসা ক্ষেত্রের মধ্যে অধিকাংশ মনোযোগ থাকে শরীরের শারীরিক দিকের প্রতি, যার ফলে নারীর শারীরিক অভিজ্ঞতা এবং তার সম্পর্কগুলো সামাজিকভাবে কীভাবে বদলায়, তা খুব কমই আলোচিত হয়। নারীর শরীরকে চিকিৎসা বিজ্ঞান কীভাবে দেখতে চায় এবং কীভাবে তা সমাজে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে, এ বিষয়ক বিতর্ক দীর্ঘ সময় ধরে চলছে। এ ধরনের বিতর্ক শুধু চিকিৎসাবিজ্ঞানী বা বিজ্ঞানী মহলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বরং এটি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে গড়ে উঠেছে। নারীর শরীরের উপস্থাপনা এবং চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে নানা রকম মতামত বা ধারণা সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

ডোনা হ্যারাওয়ের মতো বিখ্যাত চিন্তাবিদরা এই ধারণাটিকে আরও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, যেখানে তিনি বলেছেন যে নারীর শরীর এখন আর শুধু শারীরিক বাস্তবতা নয়, বরং এটি একটি সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। নারীরা নিজেদের শরীর নিয়ে কীভাবে ভাববে এবং কীভাবে তাদের শরীর চিকিৎসা ও সমাজের চোখে দেখা হবে, তা সবসময় একটা রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে ওঠে। এই প্রেক্ষাপটে, বিশেষ করে উত্তর আমেরিকা ও জাপানে নারীর বার্ধক্য এবং মেনোপজ (বয়সকালে মাসিক বন্ধ হওয়া) সম্পর্কে যে বিতর্ক ও আলোচনা চলছে, তা খুবই গুরুত্ব পূর্ণ। এই দুটি দেশের মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ধারা এবং সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য দেখে বোঝা যায়, নারীর শারীরিক পরিবর্তন এবং তার সামাজিক অভিজ্ঞতা সমাজ ও সংস্কৃতি দ্বারা কীভাবে প্রভাবিত হয় ।

আজকের তথাকথিত উন্নত বিশ্বে সমাজের বয়ঃজনিত পরিবর্তনের বিষয়টি রাজনীতিবিদ ও আমলাদের কাছে বিশেষ আগ্রহের বিষয় হয়ে উঠেছে, বিশেষ করে যেহেতু বেবি বুমার প্রজন্ম এখন মধ্যবয়স অতিক্রম করে "শরৎকালে" অর্থাৎ বার্ধক্যে পা রাখছে। তবে উত্তর আমেরিকা ও জাপানে এই "সমস্যা" একইভাবে দেখা হয় না

এবং উভয় সমাজেই মধ্যবয়সী নারীরা এই নাটকের প্রধান চরিত্র হলেও তাদের ভূমিকা দুই জায়গায় ভিন্ন ভিন্নভাবে নির্ধারিত হয়েছে। উত্তর আমেরিকায় আজ মধ্যবয়সী নারীদের নিয়ে আলোচনা প্রায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়া বা মেনোপজকে ঘিরে। চিকিৎসা বিষয়ক সাহিত্যেও (কিছু ব্যতিক্রম বাদে) মূলত নারীর শরীরের দুর্বলতা ও জীর্ণতার কথাই বলা হয়। বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণিত হয় যে ঋতুবন্ধ নারীদের দেহ ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যেতে থাকে। এই ক্ষয়প্রক্রিয়া সূক্ষ্ম, প্রাথমিক পর্যায়ে চেনাও কঠিন... এবং এখন এটি ব্যাপকভাবে স্বীকৃত যে ডিম্বাশয়ের ঘাটতির কারণেই এই উপসর্গগুলো দেখা দেয়। এইভাবে, ঋতুস্রাবের শেষকে বর্ণনা করা হয় "ডিম্বাশয়ের ব্যর্থতা"। কিংবা "ফলিকল ইউনিটের অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু" হিসেবে, যেহেতু ডিম্বাশয়ে থাকা দুই মিলিয়ন প্রাথমিক ফলিকল শিশুর গর্ভকালীন পঞ্চম মাস থেকেই ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে শুরু করে এবং এই ক্ষয় চলতে থাকে ঋতুস্রাব শেষ হওয়া পর্যন্ত—এই যুক্তি অনুযায়ী, নারীরা জন্মের আগ থেকেই পতনের পথে রওনা দেয়। যদিও এই জৈবিক পরিবর্তনকে আরও ইতিবাচকভাবে দেখার সুযোগ আছে তথাপি প্রধান আলোচনার কেন্দ্রে থাকে ক্ষয়, ব্যর্থতা ও জীর্ণতা।

প্রশ্ন উঠতে পারে, নারীদের জীর্ণতার ওপর এত গুরুত্ব কেন—যেহেতু বার্ধক্য তো পুরুষ ও নারীর জন্যই "প্রাকৃতিক" এবং অনিবার্য একটি প্রক্রিয়া? ফুঁকো তার Bio-power তত্ত্বে বলেছিলেন যে, আধুনিক সমাজে রাষ্ট্র এবং শক্তি ব্যক্তি জীবনের দেহ ও শারীরিক অবস্থার উপর গভীর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে, বিশেষত নারীর দেহের বিভিন্ন পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। নারীর মেনোপজকে "ডিম্বাশয়ের ব্যর্থতা" হিসেবে উপস্থাপন করা, সেই নিয়ন্ত্রণের একটি রূপ। নারীজীবনের এই সময়টিকে "অস্বাভাবিক" হিসেবে চিহ্নিত করা, রাষ্ট্রীয় এবং চিকিৎসা কাঠামোর মাধ্যমে নারীর শরীরের প্রতি নিয়ন্ত্রণের ইঙ্গিত দেয়। পুরুষদের বয়ঃজনিত পরিবর্তনগুলি তুলনামূলকভাবে কম আলোচনা করা হয়, কারণ তাদের বয়ঃজনিত প্রজনন সমস্যার বিষয়টি পুরুষতান্ত্রিক সমাজে খুব কম গুরুত্ব পায়।

Vanity Fair-এর একটি সাম্প্রতিক প্রবন্ধে Gail Shechy লিখেছেন, "শতাব্দীর শুরুতে একজন নারী গড়ে ৪৭ বা ৪৮ বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারতেন" (1991:227)। জীববিজ্ঞানীদের জন্য লেখা এক পাঠ্যবইয়ে Roger G. Gosden স্পষ্টভাবে বলেন, আমাদের "পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের সাম্প্রতিক দক্ষতার" কারণেই মেনোপজ-পরবর্তী নারীরা টিকে আছেন (1985:2)। তিনি আরও বলেন: “নারীরা মেনোপজ-পরবর্তী সময়ের জন্য শারীরিকভাবে বিশেষভাবে উপযোগী নন—মেনোপজ সম্ভবত এক নতুন ঘটনা, যদিও এর সম্ভাবনা দীর্ঘকাল ধরেই ছিল কারণ নারীর ডিম্বাণু একটি সীমিত ও পুনরুজ্জীবনহীন ভাণ্ডার থেকে ক্রমাগত নিঃশেষিত হয়।” (Gosden 1985:2)। আরও একটি সাধারণ ধারণা হলো—মানব নারীরাই একমাত্র স্তন্যপায়ী প্রাণী যারা মেনোপজের পরও বেঁচে থাকে। এক স্ত্রীরোগবিদ্যার বইয়ে বলা হয়েছে: “নারীর ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়া, বা মেনোপজ, প্রাণীজগতে একটি

তুলনামূলকভাবে বিরল ঘটনা। আধুনিক নারীরা তাদের পূর্বসূরি ও অন্যান্য প্রজাতির নারীদের তুলনায় ভিন্ন কারণ তারা মেনোপজের পরও ২০ থেকে ৩০ বছর বেঁচে থাকেন।" (Dewhurst 1981:592) ।

এই সব যুক্তি মিলিয়ে একটা ধারণা তৈরি হয় যে গত একশ বছরে প্রকৃতির উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে কিছু একটা ঘটেছে—আর তা হলো, পঞ্চাশোর্ধ্ব নারীদের সমাজে দৃশ্যমানতা বৃদ্ধি। চিকিৎসা সাহিত্যে যেভাবে নারীর প্রজনন অঙ্গকে "জীর্ণ" ও "ইস্ট্রোজেন-শূন্য" বলা হয়—যা নারীত্বের নির্যাস—তা নারীজীবনকে কেবলমাত্র প্রজননের সঙ্গে গেঁথে ফেলে। এর মানে দাঁড়ায়, আমাদের তথাকথিত "উন্নত" সমাজে এখন এমন নারীর সংখ্যা বাড়ছে যারা প্রজননক্ষম নন—এবং সমাজ যেন একঝাঁক চলমান অস্বাভাবিকতার সম্মুখীন হচ্ছে।

মধ্যবয়সী নারীদের প্রায়ই তুলনা করা হয় পশুপাখিদের সঙ্গে, যেখানে মনে করা হয় তারা কম গুরুত্বপূর্ণ বা "অপর্যাপ্ত", কারণ তারা আর সন্তান জন্ম দিতে পারেন না। আবার তাদের তুলনা করা হয় তরুণ ও উর্বর নারীদের সঙ্গে—যারা সন্তান জন্ম দিতে সক্ষম—এবং সেখানে মধ্যবয়সী নারীরা পিছিয়ে থাকেন। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—তাদের পুরুষদের সঙ্গে তুলনা করা হয়। Haraway বলেন, উনিশ শতকের ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় "সাধারণ বা আদর্শ মানুষ" বলতে বোঝানো হতো একজন পুরুষকে। পুরুষের শরীরকে ধরা হতো "নিরপেক্ষ" ও "সাধারণ" দেহ হিসেবে। ফলে নারীকে ধরা হতো ব্যতিক্রম বা অদ্ভুত সত্তা হিসেবে, যাদের কথা তেমন শোনা হতো না। ফরাসি দার্শনিক Simone de Beauvoir প্রথম নারীদের এই "অন্য" বা "ভিন্ন" হিসেবে চিহ্নিত করার বিষয়টি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেন। এই ধরণের চিন্তা এখনও বিদ্যমান। এখনো অনেকে মনে করেন পুরুষেরা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা রাখেন। যদিও চিকিৎসাশাস্ত্রে মাঝে মাঝে পুরুষের বয়সজনিত প্রজনন সমস্যার কথা বলা হয়, তবুও নারীদের তুলনায় পুরুষদের এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা খুবই কম হয়। এক গবেষণায় দেখা গেছে, ৬০ বছর বয়সে প্রায় ৭০ শতাংশ পুরুষ যৌনক্ষমতা হারান, আর ৮০ বছর বয়সে প্রায় সবাই (Vermeulen et al. 1982)। কিন্তু এই তথ্যগুলো নিয়ে খুব একটা আলোচনা হয় না। অন্যদিকে, নারীরা সাধারণত পুরুষদের তুলনায় বেশি দিন বাঁচেন। কিন্তু কেন এমন হয়, তা নিয়ে কোনো আলোচনা নেই। বরং নারীদের দীর্ঘ জীবনকে একটি "প্রাকৃতিক সুবিধা" হিসেবে পর্যন্ত দেখা হয় না বরং অনেক সময় তাদের বয়স বেশি হওয়াকে সমাজের জন্য বোঝা হিসেবে দেখা হয়। চিকিৎসা-সম্পর্কিত লেখাগুলোতেও এটা দেখা যায়—সেখানে প্রায়শই এমন তথ্য দিয়ে শুরু হয় যেন বেশি বয়সী নারীরা সমাজে "অতিরিক্ত" বা "উদ্বৃত্ত" ।

যেমন: আধুনিক সমাজে প্রায় সব নারীই মেনোপজে পৌঁছান, আর অনেকেই ৭৫ বছর পর্যন্ত বাঁচেন। আমেরিকায় ৫০ বছরের বেশি বয়সী নারী আছেন ৫ কোটিরও বেশি, আর তারা গড়পড়তায় ৮১ বছর পর্যন্ত বাঁচেন মানে, তারা জীবনের এক-তৃতীয়াংশ সময় মেনোপজের পর কাটান। প্রতি বছর প্রায় ৩.৫ মিলিয়ন নারী মেনোপজে পৌঁছান, এবং এটা পরের ১২ বছর ধরে চলবে। প্রতিদিন কানাডা-আমেরিকায় হাজার হাজার নারী মেনোপজে পৌঁছান, আর কেবল মেনোপজ-সংক্রান্ত সমস্যার জন্যই বছরে লাখ লাখ মানুষ চিকিৎসকের কাছে যান। এই সব তথ্য এমনভাবে বলা হয় যেন এই নারীরা সমাজের জন্য এক ধরনের "সমস্যা"। অথচ এটা নারীদের জীবনের একদম স্বাভাবিক একটা সময়। একটি চিকিৎসাবিষয়ক জার্নালে খুব পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে—বয়স বাড়ার ফলে নারীরা সমাজের জন্য আর্থিক বোঝা হয়ে উঠছেন। তাদের মতে, বেশি দিন বেঁচে থাকার "একটা খারাপ দিক" হলো অস্টিওপোরোসিস বা হাড়ক্ষয়। শুধু আমেরিকায় এই রোগের খরচ বছরে ৫ থেকে ১০ বিলিয়ন ডলার! এই পরিসংখ্যানগুলো সব সময় একে অপরের সঙ্গে মেলে না, কিন্তু এতে কারো সমস্যা নেই—কারণ বড় বড় সংখ্যাই যেন যথেষ্ট ভয় দেখানোর জন্য। এই কথাগুলো দেখে মনে হয়, নারীদের স্বাস্থ্য নয়, বরং তাদের বার্ধক্যজনিত খরচই আসল চিন্তার বিষয়। তবে এই "চিন্তা" অনেক সময় আসলে ব্যবসায়িক লাভের ছল—কারণ নারীদের সুস্থ রাখার পেছনে বড়সড় বাজার ও মুনাফার সুযোগ আছে, আর সেটাই মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। আধুনিক সমাজ ও চিকিৎসা ব্যবস্থা  নারীর বার্ধক্য—বিশেষত মেনোপজ—কে একটি অস্বাভাবিক ও সমস্যা হিসেবে উপস্থাপন করে। নারীত্বকে শুধুমাত্র প্রজননের সঙ্গে যুক্ত করে দেখা হয়, ফলে মেনোপজ-পরবর্তী নারীরা "অপ্রাকৃতিক" ও "অপ্রয়োজনীয়" হিসেবে চিহ্নিত হন। অথচ পুরুষের বার্ধক্য নিয়ে তেমন আলোচনা হয় না। এই দৃষ্টিভঙ্গি লিঙ্গবৈষম্যপূর্ণ এবং নারীদের জীবনের স্বাভাবিক পরিবর্তনকে নেতিবাচকভাবে দেখায়।

অনেক আগে থেকেই চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা মনে করেন, নারীর শরীরে ডিম্বাশয় থেকে নিঃসৃত হরমোন, বিশেষ করে ইস্ট্রোজেন, শরীরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশে (যেমন যোনি, জরায়ু, স্তন, ত্বক, হাড়) বড় ধরনের প্রভাব ফেলে। আজকের দিনে এটি একটি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত এবং সত্য অর্থাৎ এখন আর এটি নিয়ে তেমন বিতর্ক নেই। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এখন এই অঙ্গগুলোকে বলা হয় "টার্গেট অর্গান"। মেনোপজ হওয়ার সময় বা পরে, যখন ডিম্বাশয় কাজ বন্ধ করে দেয় (ovarian failure), তখন এসব অঙ্গে খারাপ প্রভাব পড়ে। যেমন: ত্বক শুষ্ক হয়ে যায়,যোনির ভেতর পাতলা ও শুষ্ক হয়,হাড় দুর্বল হতে থাকে (অস্টিওপোরোসিস),এমনকি হার্ট ও মনের অবস্থাও প্রভাবিত হয়। তবে মানসিক পরিবর্তন নিয়ে এখনো চিকিৎসাবিদ্যায় কিছুটা বিতর্ক আছে—সবাই একমত নন যে ইস্ট্রোজেন কমে গেলে মন খারাপ বা অবসাদ হয়।

আগে ডাক্তাররা মেনোপজকে খুব সাধারণ একটা বিষয় মনে করতেন। তাঁরা ভাবতেন, হট ফ্ল্যাশ, গরম লাগা—এসব সাময়িক কষ্ট, কিছুদিন পর ঠিক হয়ে যাবে। তাই বেশি কিছু করতেন না।কিন্তু এখন চিকিৎসকরা বুঝতে পারছেন যে, মেনোপজ মানে শুধু কিছু উপসর্গ না—এটা নারীর স্বাস্থ্যকে দীর্ঘমেয়াদে প্রভাবিত করতে পারে। যেমন- মেনোপজের পর ইস্ট্রোজেন কমে গেলে হাড় দ্রুত ভাঙে, হার্টের সমস্যা বাড়ে, এবং এসব কারণে নারীরা পরবর্তীকালে চিকিৎসার জন্য অর্থনৈতিকভাবে পরিবার ও সমাজের উপর নির্ভরশীল হয়ে যেতে পারেন। এই কারণে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক গবেষক এখন মেনোপজের পরে নারীর পরবর্তী ৩০ বছরকেও চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্যে আনতে চাইছেন, যাতে আগে থেকেই ঝুঁকি কমানো যায়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক গবেষণায় শুধু এটা বলা হয় না যে, নারী ও পুরুষের দেহ আলাদা। বরং সেই গবেষণাগুলোতে যেসব নারী তরুণ (বয়স কম) এবং সন্তান জন্ম দিতে পারেন, তাদের শরীরকে 'স্বাভাবিক' বলা হয়। আর যেসব নারী বয়স্ক বা সন্তান জন্ম দেওয়ার বয়স পার করে এসেছেন ( মেনোপজ হয়ে গেছে), তাদের শরীরকে 'অস্বাভাবিক' বা 'অসুস্থ' মনে করা হয়। অর্থাৎ, বয়স্ক নারীর শরীরকে একধরনের সমস্যা হিসেবে দেখা হয়, কারণ তা তরুণ নারীর শরীরের মতো নয়। ধরা যাক, একটা বইয়ে লেখা আছে—"যদি হাড়ের ঘনত্ব কমে যায় তরুণ নারীর তুলনায়, তবে সেটা রোগ।" এখানে বোঝানো হচ্ছে তরুণ নারীর শরীরই আদর্শ (Standard)।আর যিনি বয়স্ক, স্বাভাবিক ভাবেই তার হাড় কিছুটা ক্ষয় হবে, তবুও সেটা 'অসুস্থতা' হিসেবে ধরা হচ্ছে।এভাবেই বয়স্ক নারীদের শরীরকে এক ধরনের 'সমস্যা' বা 'অস্বাভাবিকতা' হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ১৯৮১ সালে অস্টিওপোরোসিসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলে: "যখন হাড়ের ঘনত্ব একজন সুস্থ, তরুণ নারীর চেয়ে অনেক কম হয়, তখন তা রোগ হিসেবে ধরা হবে।"(WHO Scientific Group 1981:42) অর্থাৎ, যুবতী নারীদের হাড়কেই "স্বাভাবিক" ধরা হচ্ছে, আর যে নারীর বয়স বেড়েছে, তার শরীরকে ধরা হচ্ছে "রোগগ্রস্ত" বা "ঝুঁকিপূর্ণ"। WHO আরও বলেছে,যদি হাড়ের ঘনত্ব বয়স অনুযায়ী ঠিক থাকে, তাহলে তা "সাধারণ অস্টিওপোরোসিস"। আর যদি তা খুব কম হয়, তাহলে সেটা "ত্বরান্বিত অস্টিওপোরোসিস"।এই সংজ্ঞা দেখে বোঝা যায়, বয়স বাড়া মানেই রোগ, এটা যেন ধরেই নেওয়া হয়েছে। তাহলে এক্ষেত্রে দেখা যায় যে নারীদের হরমোন পরিবর্তনের কারণে তাদের শরীরে বার্ধক্যজনিত সমস্যা বেশি হয়।

চিকিৎসাবিজ্ঞান এখন শুধু উপসর্গে নয়, বরং নারীর সারাজীবনের স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবছে। কিন্তু এই চিন্তার ভেতরে এক ধরনের পক্ষপাতও আছে—যেখানে বয়স্ক নারীকে "স্বাভাবিক" নয়, বরং সমস্যা হিসেবে দেখা হচ্ছে। এইভাবে চিকিৎসাবিদ্যা যেমন নারীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা করছে, তেমনই আবার বয়স ও নারীত্বকে ভিন্নভাবে চিহ্নিত করে একধরনের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিও তৈরি করছে।

১৯৩০ সালের দিক থেকে চিকিৎসকরা এক ধরনের কৃত্রিম হরমোন (যার নাম সিন্থেটিক ইস্ট্রোজেন) ব্যবহার করতে শুরু করেন। এরপর ১৯৭০-এর দশকে এসে এই ওষুধটি যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত পাঁচটি ওষুধের মধ্যে ছিল। ১৯৭৩ সালের এক গবেষণায় বলা হয়, আমেরিকার ৫১% নারী অন্তত তিন মাস এই হরমোন নিয়েছেন এবং অনেকেই গড়ে ১০ বছর পর্যন্ত এটা ব্যবহার করেছেন।(Kaufert and McKinlay, 1985) এই হরমোনটি সাধারণত মেনোপজের (রজঃনিবৃত্তি) সময় নারীদের শরীরের কিছু সমস্যার উপশমে দেওয়া হতো, যেমন—হট ফ্ল্যাশ (হঠাৎ গরম অনুভব হওয়া),অতিরিক্ত ঘাম,ঘুমের সমস্যা ইত্যাদি।এসব লক্ষণকে Vasomotor উপসর্গ বলা হয়। ১৯৭৫ সালে চারটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রকাশিত হয়। তিনটি New England Journal of Medicine-এ এবং একটি Journal of the American Medical Association-এ। এই গবেষণাগুলোতে বলা হয়েছিল , ইস্ট্রোজেন থেরাপি নেওয়ার ফলে নারীদের মধ্যে জরায়ুর ক্যান্সার (endometrial cancer) হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়।ফলে হঠাৎ করেই ইস্ট্রোজেনের ব্যবহার কমে যায়। এখন প্রশ্ন উঠল, নারীদের শরীরে মেনোপজের পর ইস্ট্রোজেন কমে যাওয়ার ফলে কী কী সমস্যা হতে পারে, আর সেগুলো থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য চিকিৎসা দরকার কিনা।এই বিষয়টি নিয়ে Kaufert and McKinlay (1985) আবার লিখেছিলেন যে—" নারীর শরীর নিয়মিত হরমোন না পেলে, তারা সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারবে না।" তবে এই বিষয়টি নিয়ে দুইটি ভিন্ন মত রয়েছে –

১. অনেক চিকিৎসক মনে করে মেনোপজ স্বাভাবিক, তাই চিকিৎসা দরকার নেই , এটি বয়স বাড়ার একটি স্বাভাবিক অংশ। যেমন, বয়স হলে চোখে কম দেখে, তখন মানুষ চশমা পরে, তেমনই মেনোপজেও হরমোন চিকিৎসা দরকার না।

২. আবার অনেকের মতে এর জন্য সঠিক চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে।Greenblatt and Teran (1987) বলেন,"শুধু সময় গেলে ঠিক হয়ে যাবে বলে সহানুভূতি দেখালে হবে না, সেটা একধরনের benign neglect(অবহেলা)।

বিভিন্ন চিকিৎসকদের মতে, নারীদের শরীরের এই পরিবর্তনকে গুরুত্ব দিতে হবে,প্রয়োজন হলে হরমোন দিয়ে চিকিৎসা করা উচিত। এই যুক্তিগুলোর কারণে ১৯৮০-এর দশকে ইস্ট্রোজেন থেরাপির ব্যবহার পুনরায় বেড়ে যায়। তবে চিকিৎসকেরা এবার বুঝতে পেরেছেন যে, শুধু ইস্ট্রোজেন দিলে হবে না, এর সঙ্গে প্রোজেস্টেরন নামক আরেকটি হরমোন দিতে হবে, না হলে ইস্ট্রোজেন একা শরীরের ক্ষতি করতে পারে। তাই এই প্রেক্ষাপটে চিকিৎসকের দায়িত্ব হচ্ছে,রোগীর ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা,কার জন্য কোন হরমোন উপযুক্ত, সেটা ঠিক করা,এবং

নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা। অবশেষে চিকিৎসকরা বুঝতে পারেন,হরমোন থেরাপি দেওয়া যায়, তবে সাবধানে ও সঠিকভাবে ।

বর্তমানে মেনোপজ নিয়ে আলোচনা শুধু স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞরাই করেন না, বরং বিষয়টি নিয়ে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ, অস্থি রোগ বিশেষজ্ঞ, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, প্লাস্টিক সার্জনসহ অন্যান্য চিকিৎসকেরাও অংশগ্রহণ করেন। এই সকল চিকিৎসকই তাদের বিশেষ ক্ষেত্রে রোগীদের নিয়ে কাজ করেন এবং প্রায়ই ক্লিনিক্যাল এপিডেমিওলজিস্টদের দ্বারা নির্ধারিত শিরোনামে প্রবন্ধ লিখে থাকেন, যেমন— "Benefits of Long-Term Treatment with Estrogens" (ইস্ট্রোজেন দিয়ে দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার উপকারিতা)। "The Use of Hormonal Replacement Therapy and the Risk of Stroke and Myocardial Infarction in Women" (নারীদের মধ্যে হরমোনাল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি ব্যবহারের ফলে স্ট্রোক ও হৃদরোগের ঝুঁকি)। "সমসাময়িক হরমোন প্রতিস্থাপন থেরাপির লক্ষ্য হলো: পূর্বনির্ধারিত জীবনকালীন ঝুঁকি কমানো। সুতরাং এই সাফল্য নির্ভর করে জীবনের নিট-মরবিডিটি (অসুস্থতা) এবং নিট-মর্টালিটি (মৃত্যুহার) এর পরিমাণগত মূল্যায়নের উপর।" (Mack and Ross 1989)। এই প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে যে বর্তমানে আটটি সাধারণ শারীরিক অবস্থার হার ইস্ট্রোজেন ব্যবহারের দ্বারা প্রভাবিত হয়, যার মধ্যে রয়েছে: হাড় ক্ষয়, হৃদরোগ, স্ট্রোক, গাঁটে ব্যথা, পিত্তথলির রোগ, জরায়ু ক্যান্সার ও স্তন ক্যান্সার। (Mack and Ross) এই প্রবন্ধে একটি "মডেল" তৈরি করেছেন, যেখানে ১০০,০০০ নারীকে ৫০ বছর বয়স থেকে ৭৫ বছর পর্যন্ত নিয়মিত হরমোন থেরাপি দেওয়া হয়। তারপর তারা হিসেব করে দেখেন, এই থেরাপি কতটা লাভ বা ক্ষতি করতে পারে। তাদের হিসাব অনুযায়ী, হরমোন থেরাপি নিলে মৃত্যুহার প্রায় ১৪% কমে, যদিও হাসপাতালে ভর্তি এবং অসুস্থ থাকার দিন কিছুটা বাড়ে। হৃদরোগ প্রতিরোধ করাই মৃত্যুহার কমার প্রধান কারণ। তবে, এই থেরাপি যদি ৫ বছর পর বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে এই সুবিধাগুলো আর পাওয়া যায় না।

তারা বলেন, অনেক নারী হয়তো স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকিতে থাকলেও, হৃদরোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তবে, শুধু এস্ট্রোজেন দিলে জরায়ু থাকা নারীদের জরায়ু ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ে। তাই অনেক চিকিৎসক এস্ট্রোজেনের সঙ্গে প্রজেস্টেরনও দেন (এটাই হচ্ছে কম্বাইন্ড হরমোন থেরাপি)। কিন্তু এই কম্বাইন্ড থেরাপিও সবসময় নিরাপদ নয়—এতে অন্যান্য রোগের ঝুঁকি বাড়তে পারে এবং দীর্ঘমেয়াদে কেউ কেউ থেরাপি চালিয়ে যেতে পারেন না। তারা আরও বলেন, কোনো চিকিৎসা পুরোপুরি ঝুঁকিমুক্ত নয়। কারো ঝুঁকি বেশি, কেউ উপকার বেশি পাবে—এমন ভেবে আলাদা করে চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব নয়। চিকিৎসকের উচিত নারীদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং নারীর নিজের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া। সেই সঙ্গে কোনো অস্বাভাবিক লক্ষণ (যেমন:

রক্তপাত বা স্তনে গাঁট) দেখা দিলে দ্রুত পরীক্ষা করানো দরকার। অন্যান্য গবেষক যেমন Milton Weinstein এবং Anna Tosteson দেখিয়েছেন, শুধু আর্থিক দিক দিয়েও এই থেরাপির সুবিধা অনিশ্চিত। তাদের গবেষণায় বলা হয়েছে, ২০০৫ সালে ৫০ থেকে ৬৪ বছর বয়সী আমেরিকান নারীর সংখ্যা ২৫ মিলিয়নের বেশি হবে। এই নারীদের হরমোন থেরাপি ও চিকিৎসক পর্যবেক্ষণের জন্য বছরে ৩.৫ থেকে ৫ বিলিয়ন ডলার খরচ হতে পারে। খরচ-সুবিধা বিশ্লেষণের পর তারা উপসংহারে বলেন, হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপির সুবিধা অত্যন্ত সন্দেহজনক—চিকিৎসার খরচ এবং নারীদের স্বাস্থ্যঝুঁকির দিক থেকে।

উত্তর আমেরিকায় মেনোপজকে প্রায়ই একটি "রোগ" হিসেবে দেখা হয়, যার জন্য চিকিৎসা প্রয়োজন। এটি চিকিৎসা ব্যবসার অংশ হয়ে উঠেছে, যেখানে হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি (HRT) ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এই চিকিৎসাগুলো শুরু করার আগে ডাক্তার ও রোগীরা "ঝুঁকি ও সুবিধা" (risk and benefit) হিসাব করে সিদ্ধান্ত নেয়। যেমন—HRT ক্যান্সার বা হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়াতে পারে, কিন্তু হাড় ক্ষয় রোধ করে বা গরম লাগা (hot flashes) কমায়।জাপানে মেনোপজকে রোগ না বলে জীবনের স্বাভাবিক একটি ধাপ হিসেবে দেখা হয়। সেখানকার নারীরা সাধারণত HRT-র দিকে ঝোঁকে না। বরং তারা খাদ্যাভ্যাস, সামাজিক যোগাযোগ ও মানসিক ভারসাম্যের মাধ্যমে মেনোপজ মোকাবিলা করেন। Margaret Lock এই পার্থক্যটিকে 'cultural construction of menopause' হিসেবে বর্ণনা করেন—যা দেখায়, চিকিৎসাবিদ্যা কেবল বিজ্ঞান নির্ভর নয় বরং সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে নির্মিত।

নারীর শরীর ও স্বাস্থ্যকে কেন্দ্র করে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে প্রতিষ্ঠানগত আধিপত্য (hegemony) গড়ে উঠেছে, তা একদিকে যেমন পুরুষতান্ত্রিক বয়ান নির্মাণ করে, অন্যদিকে তেমনি পুঁজিবাদী স্বার্থসংশ্লিষ্ট একটি শ্রেণিকে লাভবান করে। ঋতুবন্ধতা (menopause)-পরবর্তী নারীদেহকে "অপূর্ণ", "অক্ষম" বা "রোগগ্রস্ত" হিসেবে উপস্থাপন করে যে চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নয়ন হয়েছে—বিশেষত হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি (HRT)—তা শুধুই স্বাস্থ্যসেবার বিষয় নয়; বরং এটি একটি শক্তিশালী বায়োপলিটিক্যাল কৌশল, যার মাধ্যমে নারীদেহ নিয়ন্ত্রিত, ব্যাখ্যাত ও শাসিত হয় (Foucault, 1979)।১৯৮০ ও ৯০-এর দশকে যখন HRT ব্যাপকভাবে মার্কেট করা হচ্ছিল, তখন চিকিৎসাবিদরা ও ওষুধ কোম্পানিগুলো নারীদের ভয় দেখাতো—যে ঋতুবন্ধতার কারণে হাড় ক্ষয়, হৃদরোগ এবং বার্ধক্য ত্বরান্বিত হবে, এবং কেবল HRT-ই হতে পারে একমাত্র প্রতিকার (Bell, 1987; Kaufert, 1988)। এই চিকিৎসা-সংস্কৃতির মধ্যে নারীর নিজস্ব অভিজ্ঞতা, দৃষ্টিভঙ্গি বা বয়সজনিত স্বাভাবিক পরিবর্তনকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। বরং, ঋতুবন্ধতা-পরবর্তী নারীদেহকে পুনরায় যৌবনময় করে তুলবার

জন্য একটি "ব্যবসায়িক ন্যারেটিভ" তৈরি করা হয়েছে, যার মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যকে একীভূত করে তুলে ধরা হয়।

Lock (1993) তার গবেষণায় দেখান, জাপানে ঋতুবন্ধতাকে প্রাকৃতিক একটি সময় হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যেখানে মহিলারা শারীরিক পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নেয়—কোনো থেরাপির প্রয়োজন ছাড়াই। এই তুলনামূলক বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায়, ঋতুবন্ধতা আসলে সাংস্কৃতিকভাবে গঠিত একটি বাস্তবতা, যা পশ্চিমা চিকিৎসা-ইন্ডাস্ট্রি প্যাথলজাইজ করেছে।সুতরাং, এই চিকিৎসা আধিপত্য কেবল একটি চিকিৎসাগত ইস্যু নয়, বরং একটি জ্ঞান, ক্ষমতা ও পুঁজির ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রের ফলাফল—যার ভেতর দিয়ে নারীদেহকে পুনরায় উপনিবেশায়িত করা হয়।বিশ্বজুড়ে নারীর ঋতুবন্ধতা সংক্রান্ত চিকিৎসাকে ঘিরে যে হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি (HRT) চালু হয়েছে, তা একাধারে চিকিৎসা-বিজ্ঞান, ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি এবং সরকারগুলোর যৌথ স্বার্থের ফসল। ঋতুবন্ধতা, যা একটি প্রাকৃতিক শারীরিক পরিবর্তন, ১৯৬০-এর দশকের পর থেকে একটি 'রোগ' হিসেবে উপস্থাপিত হতে থাকে, এবং এর চিকিৎসা হিসেবে HRT প্রবর্তিত হয়। HRT মূলত নারীদের শরীরকে 'যৌবনময়' রাখতে এবং ঋতুবন্ধতার সাইড-এফেক্টস যেমন হট ফ্লাশ, রাতের ঘুমের সমস্যা ইত্যাদি কমানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হতো। তবে, এই চিকিৎসার পিছনে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং চিকিৎসা পেশার কর্তৃত্ব রক্ষা করার একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ছিল, যা নারী শরীরকে এক ধরনের বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে দেখতে উৎসাদেখা গেছে, HRT এর প্রচারণা এবং চিকিৎসা পদ্ধতির বিজ্ঞাপন ও নির্দেশিকা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যেন ঋতুবন্ধতাকে একটি গুরুতর রোগ হিসেবে উপস্থাপন করা হয় এবং এর চিকিৎসা না করলে নারী শরীরের এক ধরনের অবক্ষয় ঘটে, যেমন ভাঙন বা ধ্বংস। এই প্রচারণা নারীকে এমনভাবে ভয় দেখায় যে তাদের কাছে মনে হয়, ঋতুবন্ধতার জন্য চিকিৎসা গ্রহণ না করলে তাদের দেহ অস্বাভাবিকভাবে এবং দ্রুত aging হয়ে যাবে (Bell, 1987; Kaufert, 1988)। এই ভয় এবং অসহায়তার অনুভূতি থেকেই নারীরা চিকিৎসা গবেষণায় গ্রহিত করেছিল।

চিকিৎসা পুঁজিবাদে নারীর শরীর একটি 'চিকিৎসার বিষয়' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, এবং ঋতুবন্ধতা এই প্রক্রিয়ার অংশ। নারীর শরীরকে অস্বাভাবিক বা অসুস্থ হিসেবে চিহ্নিত করে তার ওপর আধিপত্য স্থাপন করা হয়। এটি ফোকোর (Foucault, 1979) 'বায়োপাওয়ার' ধারণার মতো, যেখানে নারী শরীরের উপর নিরব শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। HRT-এর মতো চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমে নারীর প্রাকৃতিক শারীরিক পরিবর্তনকে 'প্রাকৃতিক নয়' বা 'অস্বাভাবিক' হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, এবং তাকে চিকিৎসার মাধ্যমে 'সুস্থ' বা 'যৌবনময়' রাখার চাপ তৈরি করা হয়।

এভাবেই নারী শরীরকে ভয়ের মাধ্যমে পণ্যে রূপান্তরিত করা হয়। অর্থাৎ, নারীরা তাদের শরীরের যে পরিবর্তনগুলির মধ্য দিয়ে যায়, তা থেকে একটি বাণিজ্যিক উপাদান তৈরি করা হয়। বিশেষত, HRT-এর প্রচারে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলি একদিকে যেমন এটি স্বাস্থ্যগত সমস্যা হিসেবে উপস্থাপন করে, তেমনি এটি একটি আয়-উৎপাদনকারী ক্ষেত্র হিসেবেও বিবেচনা করে। নারীরা এই চিকিৎসা গ্রহণের মাধ্যমে তাদের শরীরকে আরও 'নিয়ন্ত্রণযোগ্য' ও 'প্রাকৃতিক' স্থিতিতে ফিরিয়ে আনতে পারে, এই ধারণা দিয়ে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

এছাড়া, National Women's Health Network (NWHN)-এর মতে, HRT বা অন্যান্য ঋতুবন্ধতা সম্পর্কিত চিকিৎসাকে 'অপরীক্ষিত পরীক্ষা' (uncontrolled experiment) হিসেবে বিবেচনা করা উচিত, যেখানে নারীদের পুরোপুরি জ্ঞাত সম্মতি ছাড়া ঝুঁকিপূর্ণ চিকিৎসায় যুক্ত করা হচ্ছে (NWHN, 1985)। এই ধরনের চিকিৎসা নারীর শরীরের প্রতি চিকিৎসা পেশার নিয়ন্ত্রণকে আরও দৃঢ় করে, এবং নারীদের শারীরিক স্বাধীনতা ও কর্তৃত্বকে ক্ষুন্ন করে। নারীদের এই প্রাকৃতিক শারীরিক পরিবর্তনকে 'অস্বাভাবিক' বা 'অনাকাঙ্ক্ষিত' হিসেবে দেখানো তাদের নিজেদের শরীর সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ করে দেয়।

এভাবে, ঋতুবন্ধতা এবং HRT-এর চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমে নারীর শরীরকে একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তোলা হয়, যেখানে চিকিৎসা পুঁজিবাদ, ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির স্বার্থ এবং রাষ্ট্রের শাসনমূলক কাঠামো একটি সম্মিলিত চক্রে নারীর শরীরকে তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

চিকিৎসা পুঁজিবাদী হেজেমোনির বিরুদ্ধে  নারীরা এই চিকিৎসা-পুঁজিবাদী হেজেমোনিক কাঠামোর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জানাতে শুরু করেছেন, বিশেষ করে ঋতুবন্ধতা সংক্রান্ত চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্য চর্চার ক্ষেত্রে। ঋতুবন্ধতা, যা একটি প্রাকৃতিক শারীরিক পরিবর্তন, চিকিৎসা পদ্ধতিতে সেটি 'রোগ' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে ওঠে। এর সাথে যুক্ত ছিল ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির বিপুল পরিমাণ অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং চিকিৎসা পেশার কর্তৃত্ব রক্ষা করার উদ্দেশ্য। কিন্তু অনেক নারী তাদের শরীর এবং অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে এই কাঠামোর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন তুলেছেন:

ঋতুবন্ধতা কি প্রকৃত অর্থে চিকিৎসার দাবি রাখে?

নারীরা প্রশ্ন করেছেন, কেন ঋতুবন্ধতাকে চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, যখন এটি একেবারে প্রাকৃতিক একটি শারীরিক পরিবর্তন?

নারী শরীরকে কি ঘাটতির ধারণায় বিচার করা উচিত?

নারীরা এই ধারণার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন যে, তাদের শরীরকে প্রতিনিয়ত ঘাটতির দৃষ্টিতে দেখা হয়। কেন নারীর শরীরকে শুধু 'রোগ' বা 'ঘাটতি' হিসেবে ভাবা হয়, এবং কেন তা চিকিৎসার মাধ্যমে 'সুস্থ' ও 'যৌবনময়' রাখা উচিত?

কোন চিকিৎসা, কোন গবেষণাকে ভিত্তি করে নারীর শরীর নিয়ে এমন সিদ্ধান্ত?

নারীরা প্রশ্ন তুলেছেন যে, এই চিকিৎসা ব্যবস্থার পেছনে কী ধরনের বৈজ্ঞানিক গবেষণা রয়েছে এবং তা নারী শরীরের বাস্তবতার সাথে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ?

এছাড়া, গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে, চিকিৎসা সংক্রান্ত অনেক গবেষণাই নারী শরীরের জটিলতা এবং তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটকে উপেক্ষা করে তৈরি হয়। তাই এই ধরনের গবেষণার ফলাফaল নারীদের জন্য সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য হতে পারে না (Greenhalgh, 1992)। নারীরা এই 'অবজেক্টিভ' গবেষণার ভিত্তি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন, বিশেষত যখন সেটি পুরুষতান্ত্রিক এবং একপেশে দৃষ্টিভঙ্গির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

নারী শরীরের উপর আধিপত্য ও হেজেমোনির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের একাধিক উদ্যোগ গড়ে উঠেছে, যেখানে নারীরা নিজেদের অভিজ্ঞতাকে মূল বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসা ধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। এই প্রতিরোধের মধ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন এবং কার্যক্রম রয়েছে:

১৯৭০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রে নারীবাদী স্বাস্থ্য আন্দোলন শুরু হয়, যেখানে নারীরা তাদের নিজস্ব শরীরের প্রতি অধিকার দাবি করেন। এই আন্দোলনে তারা বলেছিলেন, "আমাদের শরীর আমরা বুঝি।" নারীরা চিকিৎসা ব্যবস্থার নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ এবং পুরুষতান্ত্রিক ভাষার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছিলেন। নারীবাদী স্বাস্থ্য আন্দোলন ছিল নারীদের জন্য একটি বিকল্প চিকিৎসা জ্ঞানের ক্ষেত্র, যেখানে নারী শরীরের জটিলতা এবং তার প্রাকৃতিক পরিবর্তনগুলির গুরুত্ব বিবেচনা করা হয়েছিল।

নারীর শরীর সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার নারীরই থাকা উচিত, কোনো চিকিৎসক বা কোম্পানির নয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, ঋতুবন্ধতা বা অন্যান্য শারীরিক পরিবর্তনকে 'রোগ' হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং এর চিকিৎসা হিসেবে হরমোন থেরাপি (HRT) বা অন্যান্য ওষুধের ব্যবহারকে চাপানো হয়। এতে নারীরা কখনো তাদের শরীর নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হন না, বরং তারা চিকিৎসক বা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির সিদ্ধান্তের অধীন হয়ে পড়েন। এই পরিস্থিতিতে নারীদের শরীরের উপর নিজস্ব অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা জরুরি। নারীরা যদি

তাদের শরীর নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে না পারেন, তবে তাদের শারীরিক স্বাধীনতা এবং সার্বিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয় (Foucault, 1979)।

অন্তর্ভুক্তিমূলক স্বাস্থ্যচর্চা:বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রথাগতভাবে এক পন্থায় নারীর স্বাস্থ্য বিবেচনা করে, যেখানে সাধারণত শ্বেতাঙ্গ, ধনী এবং হেটেরোসেক্সুয়াল নারীর অভিজ্ঞতাকেই মূল ভিত্তি ধরে স্বাস্থ্য পদ্ধতি তৈরি করা হয়। ফলে, কৃষ্ণাঙ্গ, গরিব, প্রতিবন্ধী, বা ট্রান্সজেন্ডার নারীদের অভিজ্ঞতা অনেক সময় অবহেলিত বা উপেক্ষিত হয়। অন্তর্ভুক্তিমূলক স্বাস্থ্যচর্চার জন্য প্রয়োজন এমন একটি স্বাস্থ্যনীতি, যেখানে এই সব নারীর অভিজ্ঞতা এবং তাদের চাহিদা গুরুত্ব পায়। নারীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সিদ্ধান্তে জাতিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং শারীরিক বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি দেয়ার মাধ্যমে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরও দক্ষ এবং কার্যকরী করা সম্ভব (Crenshaw, 1991)।

বিকল্প জ্ঞানচর্চা:নারীর স্বাস্থ্য কেবল প্যাথোলজি (রোগবিদ্যা) দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না। শরীরের প্রাকৃতিক পরিবর্তন যেমন ঋতুবন্ধতা, সেগুলিকে 'রোগ' হিসেবে চিহ্নিত করা এবং চিকিৎসার মাধ্যমে 'সুস্থ' করতে চাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। নারী স্বাস্থ্যকে পুরোপুরি প্যাথোলজি বা শুধুমাত্র চিকিৎসা ভিত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার না করে, খাদ্য, ব্যায়াম, হোমিওপ্যাথি বা হোলিস্টিক পদ্ধতিতে (যেখানে শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য একত্রে দেখার চেষ্টা করা হয়) গুরুত্ব দিতে হবে। বিকল্প জ্ঞানচর্চা নারীর শরীরের প্রতি একটি সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করতে সাহায্য করে এবং স্বাস্থ্যচর্চায় নারীর নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং শারীরিক স্বাধীনতা প্রাধান্য পায় (Bordo, 1993)।

পোস্টমেনোপজাল নারীদের চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়টি প্রাচীনকাল থেকে আলোচিত হয়ে আসছে, তবে এটি ২০শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকেই একটি গভীর এবং জটিল আলোচনা রূপে পরিণত হয়েছে। বিশেষত, নারীদের হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি (HRT) এর ব্যবহার নিয়ে বিতর্কের মূল কারণগুলির মধ্যে অন্যতম হলো চিকিৎসক, ঔষধ কোম্পানি এবং সরকারের বিভিন্ন স্বার্থের সংঘাত। এই প্রবন্ধে, আমরা দেখবো কিভাবে এই ত্রিমুখী সম্পর্কটি গড়ে উঠেছে এবং কীভাবে এটি নারীদের স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসায় প্রভাব ফেলেছে।

১৯৪০-এর দশকে সিণেথটিক এস্ট্রোজেনের আবিষ্কার এবং এটি পোস্টমেনোপজাল নারীদের চিকিৎসায় ব্যবহারের সম্ভাবনা ঔষধ শিল্পের জন্য একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। ঔষধ কোম্পানিগুলি তখন থেকে এই থেরাপির প্রচার চালাতে শুরু করে এবং ১৯৬০-এর দশকে এটি একটি প্রচলিত চিকিৎসা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলত, এস্ট্রোজেন এবং প্রজেস্টেরোন (যেগুলি মেনোপজের পর নারীর শরীরে হরমোনের অভাব পূরণের জন্য ব্যবহার

করা হয়) এই থেরাপির প্রধান উপাদান হয়ে ওঠে। ঔষধ কোম্পানিগুলি মেনোপজাল নারীদের জন্য এই হরমোনগুলি বিক্রি করতে শুরু করে, যা বিপুল আর্থিক লাভের সুযোগ সৃষ্টি করে (লক, ১৯৯৩)।

১৯৬০-এর দশকের শেষের দিকে, একাধিক ঔষধ কোম্পানি প্রচারমূলক ক্যাম্পেইন চালায়, যেখানে হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপির সুবিধা এবং এই চিকিৎসার প্রভাবের উপর ফোকাস করা হয়। এই সময়ে, হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপির সুবিধা হিসেবে নারীদের জীবনের গুণগত মান উন্নত করার কথা বলা হতো। নারীরা তাদের শারীরিক দুর্বলতা এবং মেনোপজের উপসর্গ থেকে মুক্তি পাবে, এমন প্রচার চালানো হয়, যার ফলে বাজারে এই থেরাপির ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি হয়। একদিকে যেমন হরমোন থেরাপি একটি স্বাস্থ্যসম্মত পন্থা হিসেবে উপস্থিত করা হয়, তেমনি অন্যদিকে ঔষধ কোম্পানিগুলি বিপুল পরিমাণে লাভবান হয় (ফুরম্যান, ১৯৭১)।

কিন্তু এই থেরাপি ব্যবহারের সাথে সাথে ঔষধ শিল্পের আরও কিছু বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়। ১৯৭০-এর দশকের শেষের দিকে, যখন কিছু গবেষণায় এই থেরাপির দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া যেমন স্তন ক্যান্সার, হৃদরোগ এবং স্ট্রোকের মতো ঝুঁকি বাড়ানোর বিষয়টি সামনে আসে, তখন ঔষধ কোম্পানিগুলির পক্ষে তা স্বীকার করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে ওঠে (লক, ১৯৯৩)। তবে, এই বিপরীত চিন্তাভাবনা এবং পরবর্তী গবেষণা, ঔষধ কোম্পানিগুলিকে শুধু তাদের লাভের দিকে নজর না দিয়ে, এর সম্ভাব্য ঝুঁকিও মাথায় রেখে কার্যক্রম পরিচালনা করার দিকে প্রেরণা দেয়।

অতএব, ঔষধ শিল্পের প্রচেষ্টা ছিল শুধু একটি লাভজনক বাজার সৃষ্টি করা নয়, বরং এই থেরাপির মাধ্যমে মেনোপজ পরবর্তী নারীদের স্বাস্থ্যকর জীবনধারার প্রতিশ্রুতি দেওয়া। কিন্তু এই উদ্যোগের পাশাপাশি, ঔষধ কোম্পানিগুলির দ্বিমুখী প্রভাবের কারণেই হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপির ব্যবহার এবং তার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ে বিতর্ক ও আলোচনা অব্যাহত থাকে।

সরকারের দৃষ্টিতে, aging female population (বয়স বৃদ্ধ নারীদের) সুরক্ষা এবং চিকিৎসার খরচ একটি বড় সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। চিকিৎসা ব্যয় বৃদ্ধি, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যসেবার খরচের ক্ষেত্রে বৃদ্ধ নারীরা একটি চাপ হয়ে উঠেছে। পোস্টমেনোপজাল নারীরা একদিকে যেমন শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন এবং বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যায় ভোগেন, যেমন অস্টিওপোরোসিস, হৃদরোগ, এবং হরমোনের অভাবে অস্বস্তি, তেমনি অন্যদিকে এই নারীদের চিকিৎসা ব্যয় সমাজের জন্য একটি ভারী বোঝা হয়ে ওঠে। এই বিষয়টি সরকারের জন্য একটি বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, কারণ স্বাস্থ্যসেবা খাতে খরচ বেড়ে যাওয়ায় জাতীয় বাজেটের উপর চাপ পড়ে (লক, ১৯৯৩)।

সরকারের মূল লক্ষ্য থাকে জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা, তবে, এই সুরক্ষা প্রদান করার জন্য যে পরিমাণ খরচ প্রয়োজন, তা অনেক সময় সরকারকে অর্থনৈতিক চাপের মধ্যে ফেলে। বিশেষত, aging population এর জন্য যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহ করতে গিয়ে সরকারের জন্য এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক চ্যালেঞ্জ হয়ে ওঠে। এ কারণে, সরকার মেনোপজ পরবর্তী নারীদের চিকিৎসার খরচ কমানোর উপায় নিয়ে আলোচনা শুরু করে এবং এক পর্যায়ে হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি (HRT) এর ব্যবহারকে একটি প্রমোট করা ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করা হয়, যা নারীদের স্বাস্থ্য সমস্যাগুলির প্রাথমিক প্রতিকার হতে পারে (কাফার্ট এবং মাকিনলে, ১৯৮৫)।

এছাড়া, সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল স্বাস্থ্যসেবা খরচ কমিয়ে দীর্ঘমেয়াদী ফান্ডিং সংকট এড়ানো। হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি, যার মাধ্যমে মেনোপজজনিত সমস্যা প্রতিরোধ করা সম্ভব, সেই চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রচারে সরকার ঔষধ শিল্পের সঙ্গে অংশীদারিত্ব তৈরি করে। এর মাধ্যমে, সরকার একদিকে যেমন মহিলাদের জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে চায়, তেমনি অপরদিকে ঔষধ শিল্পকে লাভবান করে তাদের প্রোডাক্টের বাজার সম্প্রসারণে সাহায্য করে। এর ফলে, ঔষধ শিল্প এবং সরকারের মধ্যে এক ধরনের সহযোগিতা ও সমঝোতা তৈরি হয়, যেখানে ঔষধ শিল্পের আধিপত্য বৃদ্ধি পায় এবং সরকার তাদের বাজারের লাভের অঙ্গীকার করে থাকে (লক, ১৯৯৩)।

এই প্রক্রিয়ায়, সরকার সুরক্ষিত ও স্বাস্থ্যকর বৃদ্ধ বয়সের জীবনযাত্রা নিশ্চিত করতে চেষ্টা করে, তবে ঔষধ শিল্পের কাছে চিকিৎসার ব্যয় ও লাভের বিষয়ে একটি সমঝোতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। তবে, এই সামগ্রিক সমঝোতা কখনো কখনো বিতর্কের জন্ম দেয়, কারণ অনেকেই মনে করেন, চিকিৎসার পরিমাণ বা বাজারের চাপের কারণে নারীদের স্বাস্থ্যের প্রকৃত সমস্যার মোকাবিলা না করে শুধুমাত্র এক একটি লাভজনক ব্যবসায়িক মডেল তৈরি হচ্ছে (কাফার্ট এবং মাকিনলে, ১৯৮৫)।

এছাড়া, সরকারের খরচ কমানোর উদ্দেশ্য যুক্তিযুক্ত হলেও, দীর্ঘমেয়াদী হরমোন থেরাপির ব্যবহারে যে স্বাস্থ্য ঝুঁকি রয়েছে, তা কখনো কখনো উপেক্ষা করা হয়। ফলে, সরকার, ঔষধ শিল্প এবং চিকিৎসকদের মধ্যে এই ভূমিকা এবং আর্থিক প্রভাবের কূটনৈতিক সম্পর্ক আরও জটিল হয়ে ওঠে এবং একই সঙ্গে স্বাস্থ্যসেবার মূল লক্ষ্য - জনগণের সুরক্ষা - তা প্রশ্নবিদ্ধ হয়।

এটি স্পষ্ট যে, চিকিৎসক, ঔষধ শিল্প এবং সরকার একত্রে নারীদের পোস্টমেনোপজাল স্বাস্থ্য বিষয়ে একটি বৃহৎ অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কাঠামো গড়ে তুলেছে, যেখানে নারীদের স্বাস্থ্য এবং তাদের চিকিৎসা একদিকে যেমন ব্যবসার অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে, অন্যদিকে এটি রাষ্ট্রীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হয়ে উঠেছে। মেনোপজ পরবর্তী

নারীদের শারীরিক পরিবর্তন এবং স্বাস্থ্যের পরিবর্তনগুলির প্রতি ঔষধ শিল্পের আগ্রহ এবং সরকারের আর্থিক চাপ এই কাঠামোটিকে আরও জোরদার করেছে। ঔষধ শিল্প তাদের প্রোডাক্টের বাজারের জন্য মেনোপজ এবং এর পরবর্তী শারীরিক সমস্যা নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে, সরকারের লক্ষ্য থাকে স্বাস্থ্যখাতে খরচ কমিয়ে মেনোপজজনিত সমস্যাগুলির চিকিৎসার মাধ্যমে জনগণের সুস্থতা নিশ্চিত করা। একই সঙ্গে, চিকিৎসক সমাজও এই চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করে, যা নারীদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নতুন পদ্ধতির দিকে পরিচালিত করে।

এই দ্বন্দ্ব এবং বিতর্কগুলি শুধুমাত্র নারীদের শরীরের চিকিৎসা সম্পর্কিত নয়, বরং এই সম্পর্কের মধ্যে যে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ফ্যাক্টরগুলি জড়িয়ে রয়েছে, সেগুলিও গভীরভাবে প্রভাবিত করছে। ফলে, নারীর শরীরের প্রতি সামাজিক এবং চিকিৎসাগত দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার উপর নির্ভরশীল অর্থনৈতিক কাঠামো সমাজে গভীর প্রভাব ফেলছে এবং এই বিষয়টি ভবিষ্যতেও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা এবং বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হতে থাকবে।

পরের অংশে নারীর বার্ধক্য এবং আধুনিক জাপানের মধ্যে সম্পর্কের উপর আলোকপাত করে। এটি বোঝায় যে, জাপানে নারীর বার্ধক্য শুধুমাত্র একটি শারীরিক প্রক্রিয়া নয়, বরং এটি একটি সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সমস্যা, যা আধুনিক সমাজে এক ধরনের বিচ্যুতি হিসেবে দেখা হয়। জাপানির সমাজে, যেখানে নারীরা ঐতিহ্যগতভাবে গৃহকর্ম এবং পরিবারের দেখভালের দায়িত্ব পালন করে আসছে, তাদের বার্ধক্য এবং মেনোপজের সময় তাদের সামাজিক ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। সমাজের একাংশ নারীদের বার্ধক্যকে একটি অপ্রয়োজনীয় বা পুরনো অবস্থান হিসেবে দেখে, যা তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়কে সংকুচিত করে দেয়। এই অবস্থাটি আধুনিক জাপানে নারীদের মধ্যে অবমূল্যায়ন এবং সামাজিক বিচ্যুতি সৃষ্টি করে।এটি আধুনিকীকরণ এবং শিল্পায়নের প্রেক্ষাপটে নারীর পরিবর্তিত ভূমিকা, বিশেষ করে কর্মজীবনে নারীদের অংশগ্রহণ এবং তাদের পরিবারিক দায়িত্ব পালনের মধ্যে একটি সমন্বয়ের অভাবকে তুলে ধরে।

মার্গারেট লক তার প্রবন্ধ "The Politics of Midlife and Menopause"-এ মেনোপজ ও মধ্যবয়সকে শুধুমাত্র একটি জৈবিক পরিবর্তন হিসেবে না দেখে, বরং এটি এক ধরনের সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক নির্মাণ হিসেবে বিশ্লেষণ করেছেন। তার মতে, মেনোপজের অভিজ্ঞতা এক দেশে আরেক দেশে আলাদা হতে পারে, এবং এই অভিজ্ঞতাগুলো সমাজ ও সংস্কৃতি দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। বিশেষ করে, লক জাপানের উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন, যেখানে এই প্রক্রিয়াটি একটি নির্দিষ্ট সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর মধ্যে পরিণত হয়।

যুদ্ধ-পরবর্তী জাপানে সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। পারিবারিক কাঠামো ও সামাজিক নিয়মের পরিবর্তনের ফলে একটি নৈতিক শূন্যতা সৃষ্টি হয়, যার ফলে একধরনের মানসিক এবং শারীরিক অসুবিধা দেখা দেয়। এই অসুবিধাগুলোর মধ্যে "মেনোপজাল সিনড্রোম" একটি নতুন সংজ্ঞা হয়ে দাঁড়ায়, যা বিশেষভাবে শহরের মধ্যবিত্ত গৃহিণীদের মধ্যে দেখা যায়। এই সিনড্রোমকে একটি 'অভিজাত রোগ' হিসেবে দেখা হয়, যার মধ্যে মানসিক চাপ এবং এক ধরনের হতাশা অন্তর্ভুক্ত।

জাপানে একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে, যাদের জীবনে কোনো 'উদ্দেশ্য' নেই, তারা মেনোপজের সময়ে বেশি সমস্যা অনুভব করেন। "Ikigai" (জীবনের উদ্দেশ্য) ধারণাটি এখানে গুরুত্বপূর্ণ। যারা চাকরি বা সমাজে কোনো ভূমিকা রাখেন না, তাদের জন্য মেনোপজ একটা বড় সংকট হয়ে ওঠে। এটি নারীকে শারীরিক এবং মানসিকভাবে দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত করে, যা নারীবাদীরা তীব্রভাবে সমালোচনা করেছেন। যুদ্ধ-পরবর্তী সমাজে নারীদের কর্মজীবনে প্রবেশ করা সীমিত ছিল, এবং যারা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারেননি, তাদের সামাজিক অবস্থান সংকুচিত হয়ে পড়ে।

গ্রামীণ এলাকায় নারীরা অত্যন্ত কর্মব্যস্ত, তাই তারা মেনোপজের বিষয়টি নিয়ে তেমন ভাবেন না। সেখানে সমাজে ভূমিকা রাখা নারীরা সহজেই শারীরিক ও মানসিক সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারেন। তবে, শহুরে মধ্যবিত্ত গৃহিণীদের জন্য এটা বড় একটি সমস্যা, যাদের জীবনে কর্মের বা অন্য কোনো উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্য নেই। এই ধারণাটি নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচিত, কারণ এটি নারীদের কাজের প্রাপ্যতা এবং তাদের সামাজিক অবস্থানকে অবমূল্যায়ন করে।

জাপানে, বিশেষত গৃহিণীদের জন্য চাকরি বা পেশাজীবন থেকে দূরে থাকা সামাজিকভাবে প্রত্যাশিত। তবে, মেনোপজ পরবর্তী সময়ে যখন নারীরা "অপ্রাসঙ্গিক" বা "অপ্রয়োজনীয়" হয়ে পড়েন, তখন তাদের সামাজিক অবস্থান কমে যায়। সমাজ তাদেরকে আরো নির্দিষ্ট ভূমিকা থেকে বিচ্যুত বলে মনে করে। সরকার নারীদেরকে ঘরকন্নার কাজের জন্য উৎসাহিত করে, কিন্তু তারা কর্মজীবনে ফিরতে চাইলে অনেক বাধার মুখোমুখি হন।

জাপানে নারীরা, বিশেষ করে গরিব ও গ্রামীণ নারীরা, অনেক সময় পারিশ্রমিকবিহীন শ্রমে যুক্ত থাকেন। পরিবারে বৃদ্ধদের যত্ন নেওয়ার কারণে তাদের নিজস্ব জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। নারীরা দীর্ঘকালীন শারীরিক শ্রমে জড়িয়ে থাকলেও তাদের কাজের মূল্যায়ন হয় না। নারীবাদী আন্দোলন এ বিষয়গুলো নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে—কেন নারীদের অদৃশ্য শ্রমকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না এবং কেন সমাজ তাদের শ্রমের মূল্যায়ন থেকে পিছিয়ে থাকে?

জাপানি সমাজে বার্ধক্যকে একটি প্রাকৃতিক ও সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা হয়, যা জীবনের স্বাভাবিক অগ্রগতির অংশ। এই সমাজে সময়ের প্রবাহ এবং জীবনের ক্ষণস্থায়ীতা সম্পর্কে একটি সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতা রয়েছে, যা ব্যক্তি ও সমাজের মাঝে এক ধরণের গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি করে। অতীতে নারী-পুরুষ উভয়ের জীবনধারার গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তরগুলোকে সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চিহ্নিত করা হতো এবং পূর্বপুরুষদের উপস্থিতি ও অতীত প্রজন্মের সঙ্গে ধারাবাহিকতা একটি 'cosmically ordained order'-এর ধারণা প্রতিষ্ঠা করত (Smith 1974)। নারীদের জীবনে বয়স বৃদ্ধির অভিজ্ঞতা মূলত তাদের পারিপার্শ্বিক সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তনের মাধ্যমেই অনুভব করা হয় এবং নারীদের জীবনের অর্থ তাদের নিজস্ব অর্জনের পরিবর্তে অন্যদের জন্য অবদান রাখার মাধ্যমে মূল্যায়িত হয় (Plath 1980)। এই প্রেক্ষাপটে ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়াকে একটি বড় সামাজিক বা শারীরিক চিহ্ন হিসেবে দেখা হয় না; বরং বার্ধক্যের অন্যান্য লক্ষণ যেমন চুল পাকা, দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হওয়া বা স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ হওয়া বেশি গুরুত্ব পায়, যা ভবিষ্যতের শারীরিক অক্ষমতার সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয় (Lock 1986)।

জাপানে মেনোপজকে বলা হয় "kõnenki" এবং এটি একটি বয়সজনিত স্বাভাবিক পরিবর্তন হিসেবে নারীরা সাধারণত মেনে নেন। শতাধিক নারীর সাক্ষাৎকার নেওয়া হলে সেখানে দেখা যায়, তাঁদের মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশই জানিয়েছেন যে, তারা kõnenki চলাকালীন সময় তেমন কোনো বড় ধরনের শারীরিক সমস্যা অনুভব করেননি। কেউ কেউ হালকা মাথাব্যথা, ঘুমের সমস্যা, শরীর খারাপ লাগা, কাঁধে টান লাগা, চোখের দৃষ্টি দুর্বল হওয়া কিংবা শরীর দুর্বল হয়ে পড়ার মতো অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। অনেকেই বলেছেন, তারা এগুলোকে অসুস্থতা হিসেবে না দেখে বরং বয়সের স্বাভাবিক পরিবর্তন হিসেবেই বিবেচনা করেছেন।

শুধুমাত্র একটি ছোট অংশ, অর্থাৎ ১২ জন নারী জানিয়েছেন যে, তারা দিনে কয়েকবার হঠাৎ করে গরম অনুভব করতেন—যাকে হট ফ্ল্যাশ বলা হয়। তবে তারা এটিকে লজ্জাজনক বা অস্বাভাবিক কিছু মনে করেননি এবং চিকিৎসার প্রয়োজনও মনে করেননি। গবেষণায় নারীদের একটি বড় উপসর্গ তালিকা দিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়, গত দুই সপ্তাহে তারা কী ধরনের শারীরিক পরিবর্তন বা সমস্যা অনুভব করেছেন। সেখানেও দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি যে উপসর্গগুলো উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো হলো—কাঁধে ব্যথা বা শক্ত হয়ে যাওয়া, মাথাব্যথা, পিঠের নিচে ব্যথা (লোয়ার ব্যাক পেইন), কোষ্ঠকাঠিন্য, ঠান্ডা লাগা বা শীত শীত অনুভব, মেজাজ খিটখিটে হয়ে যাওয়া, ঘুম না আসা, হাড়ের সন্ধিতে ব্যথা, ঘন ঘন ঠান্ডা লাগা, গলা ব্যথা, শরীর অবশ লাগা এবং কিছু ক্ষেত্রে স্মৃতিভ্রষ্টতা ও হঠাৎ গরম লাগা। তবে উত্তর আমেরিকার নারীদের তুলনায় জাপানি নারীদের মধ্যে হট ফ্ল্যাশ ও নাইট সুয়েটের মতো ‘ক্লাসিক’ মেনোপজ লক্ষণগুলো অনেক কম দেখা গেছে।

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী অনেক নারী বলেছেন যে, kõnenki কারো কারো ক্ষেত্রে ত্রিশের শেষ দিকেই শুরু হয়, আবার অনেকের kõnenki একেবারেই হয় না, অর্থাৎ তারা কোনো ধরনের উপসর্গই অনুভব করেন না। মূলত, জাপানি নারীরা তখনই মেনোপজকে অসুস্থতা হিসেবে ভাবতে শুরু করেন, যখন 'kõnenki' শব্দটির সঙ্গে 'Sogai' (অর্থাৎ শারীরিক খারাপ প্রভাব বা সমস্যা) শব্দটি যুক্ত হয়। তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে kõnenki একটি স্বাভাবিক, ধীরে ধীরে আসা বয়সজনিত পরিবর্তন, যা সবাই একভাবে অনুভব করেন না। তারা সাধারণত এ সময়টিকে জীবনের এক নতুন অধ্যায় হিসেবে মেনে নেন, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চিকিৎসা বা ওষুধের উপর নির্ভর না করেই নিজেদের মানসিক ও শারীরিকভাবে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করেন।

অনেক আগে থেকেই চীনা ও জাপানি ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসাব্যবস্থায় বিশ্বাস করা হতো, নারীদের মাসিক বন্ধ হয়ে গেলে শরীরে "পচা রক্ত" জমে যায়। এ রক্ত শরীর থেকে বের না হওয়ায় অনেক অস্পষ্ট ধরনের উপসর্গ দেখা দিতে পারে, যেমন—মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড় করা, মাথাব্যথা, গা ঠান্ডা লাগা, কাঁধ শক্ত হওয়া, মুখ শুকিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। তখন এগুলোর জন্য কোনো নির্দিষ্ট শব্দ ছিল না।১৯ শতকের শেষ দিকে যখন জাপান ও ইউরোপের মধ্যে ব্যাপক যোগাযোগ শুরু হয়, তখন ইউরোপীয় "climacterium" বা মধ্যবয়সে নারীর শরীরের পরিবর্তন বোঝাতে জাপানে "kõnenki" শব্দটি তৈরি হয়। তখন এটা নারী-পুরুষ সবার জীবনচক্রের বড় বড় পরিবর্তন বোঝাতে ব্যবহার হতো। পরে এটি বিশেষভাবে নারীদের জন্য, মাসিক বন্ধ হওয়া ও তার আশেপাশের সময়কাল বোঝাতে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। যদিও ইংরেজিতে "menopause" বা "মাসিক বন্ধ হওয়া" বলতে আলাদা শব্দ আছে, জাপানি সাধারণ ভাষায় এখনও তেমন কোনো শব্দ নেই, শুধু চিকিৎসাশাস্ত্রে কিছু শব্দ আছে যেগুলো সাধারণ মানুষ খুব একটা ব্যবহার করে না। ১৯২০ সালের পর থেকে জাপানে "মেনোপজ" বা "মাসিক বন্ধ" বোঝাতে আজও কোনো সহজ, সাধারণ শব্দ নেই। হট ফ্লাশসহ কিছু জটিল ডাক্তারি শব্দ ব্যবহার করা হলেও, তা টেকেনি। আজও জাপানি নারীরা এই অভিজ্ঞতা বোঝাতে বলে "হঠাৎ গরম লাগে", "রক্ত মাথায় উঠে যায়", বা "মুখ লাল হয়ে যায়", কিন্তু "হট ফ্ল্যাশ" বোঝাতে আলাদা কোনো শব্দ নেই। অথচ জাপানি ভাষায় শরীর নিয়ে নানা সূক্ষ্ম অনুভূতি বোঝাতে অনেক শব্দ আছে।

জার্মানিতে যখন ১৮৯৮ সালে "autonomic nervous system" বা "স্বায়ত্ত স্নায়ুতন্ত্র" নিয়ে আলোচনা শুরু হয়, তখন জাপানি চিকিৎসকেরা এটি ভালোভাবে গ্রহণ করেন, কারণ এটি তাদের প্রচলিত চিকিৎসার ধারণার সঙ্গে মিলে যায়। পরে, যখন হরমোন ও এই স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে বলা হয়, তখন তারা বুঝতে পারেন, kõnenki র সময় এই স্নায়ুতন্ত্রের ভারসাম্য নষ্ট হয়। এখনো জাপানে এই ধারণাই চালু আছে যে নারীরা বয়স

বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই স্নায়ুতন্ত্রের ভারসাম্য হারায়, আর এর পেছনে ইস্ট্রোজেন কমে যাওয়ারও কিছুটা ভূমিকা থাকে।

জাপানে আগেকার দিনে অস্ত্রোপচারের চল ছিল না। তাই ডিম্বাশয় কাটাছেঁড়া করে দেখা হতো না, যেটা ইউরোপ-আমেরিকায় প্রচলিত ছিল। ফলে জাপানি চিকিৎসকেরা শরীরের গঠন (অ্যানাটমি) নয়, শরীর কীভাবে কাজ করে (ফিজিওলজি) সেটার ওপর বেশি গুরুত্ব দিতেন। আর তাই কোনেনকি নিয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল শরীরের ভারসাম্য ও কার্যক্রম নিয়ে।এই কারণে জাপানে অনেক নারী kõnenki র উপসর্গ নিয়ে গাইনির কাছে না গিয়ে সাধারণ মেডিসিনের চিকিৎসকের কাছে যান, কারণ গাইনি চিকিৎসা মূলত অপারেশনের জন্য। ফলে জাপানে কোনেনকি নিয়ে চিকিৎসা ও আলোচনা একেবারেই ভিন্নরকম।

পশ্চিমে মেনোপজ মানেই "হট ফ্ল্যাশ" বা গরম অনুভব, কিন্তু জাপানে তা খুব কম হয়। বরং মাথা ঘোরা, ঘাড় শক্ত হওয়া, কানে শব্দ হওয়া এসব উপসর্গ বেশি দেখা যায়। এখানে বিশ্বাস করা হয়, এসব উপসর্গ সাধারণ ব্যাপার, তবে মধ্যবিত্ত গৃহিণীরা বেশি অভিযোগ করেন এবং চিকিৎসা চান, যেখানে অন্যরা মানসিকভাবে শক্ত থেকে কষ্টকে মোকাবিলা করেন। আর একটা বড় পার্থক্য হলো—জাপানে জন্মনিয়ন্ত্রণের পিল এখনো সহজলভ্য নয়। অনেকে ভয় পান যে, পিল খেলে শরীরের ক্ষতি হতে পারে। এই ভয় হরমোন থেরাপির ক্ষেত্রেও আছে, কারণ হরমোন থেরাপির গঠন পিলের মতোই। জাপানি নারীরা এই বিষয়টি বোঝেন এবং তাই সাধারণত হরমোন থেরাপি গ্রহণ করতে চান না। জাপানে "kõnenki" বলতে বোঝায় দীর্ঘ সময় ধরে চলা একটি দেহগত ও মানসিক পরিবর্তনের ধারা, যেটা মেনোপজের মতো হলেও, তার ধরন, ভাষা ও চিকিৎসা-পদ্ধতি পশ্চিমের তুলনায় আলাদা।

জাপানে সাধারণভাবে একজন চিকিৎসক একইসাথে প্রসূতি ও স্ত্রীরোগের চিকিৎসা করেন। তারা নিজেরাই ছোট ছোট ক্লিনিক বা হাসপাতাল চালান। তাদের আয়ের প্রধান উৎস হলো সন্তান প্রসব করানো, গর্ভপাত করানো এবং ছোট সার্জারি করা। কিন্তু এখন অনেক নারী বড় হাসপাতালে গিয়ে সন্তান প্রসব করাচ্ছেন, আর গর্ভপাতের সংখ্যাও কমে গেছে। কারণ, এখন নারীরা গর্ভধারণ না করার পদ্ধতি (যেমন কনট্রাসেপশন) অনেক ভালোভাবে ব্যবহার করছেন, যদিও জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ি (পিল) জাপানে সহজে পাওয়া যায় না। আগে পর্যন্ত জাপানে মেনোপজ (মধ্যবয়সে নারীদের হরমোন পরিবর্তনের সময়কাল) নিয়ে চিকিৎসকরা খুব একটা গুরুত্ব দিতেন না। কিন্তু এখন অনেক চিকিৎসক অর্থনৈতিক চাপে পড়েছেন, তাই তারা নতুনভাবে কাজের পথ খুঁজছেন। কেউ কেউ মধ্যবয়সী নারীদের জন্য পরামর্শ দেওয়ার (কাউন্সেলিং) সেবা শুরু করেছেন, কেউ আবার এই বিষয়ে বই ও পত্রিকায়

লিখছেন। যদিও অনেক পরিবর্তন এসেছে, তবুও জাপানে এখনো হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি (HRT) খুব বেশি ব্যবহার করা হয় না। বরং গাছ-গাছড়া বা ভেষজ ওষুধই বেশি ব্যবহার হয়।

জাপানের চিকিৎসকরা পশ্চিমা দেশগুলোর মতোই চিকিৎসা বিষয়ক লেখা পড়েন। তবুও জাপানে মেনোপজজনিত ওষুধ কম ব্যবহার হয়। এর পেছনে একটা কারণ হলো— জাপানি নারীদের হৃদরোগে মৃত্যুর হার আমেরিকান নারীদের চেয়ে অনেক কম। জাপানি নারীরা হাড় ক্ষয়ের (অস্টিওপরোসিস) সমস্যায় পুরুষদের তুলনায় বেশি ভোগেন, তবে আমেরিকান নারীদের তুলনায় তাদের সমস্যা কম। তাদের স্তন ক্যান্সারে মৃত্যুর হারও কম। এসব কারণে জাপানের চিকিৎসকরা মেনোপজ নিয়ে বেশি চিন্তিত নন। বরং তারা ভয় পান এই থেরাপির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ে।

জাপানি চিকিৎসকরা সাধারণত মেনোপজে থাকা নারীদের বলেন—ভালো খাবার খাও, ব্যায়াম করো। আর তাতেই নারীরা সন্তুষ্ট থাকেন। স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য দিয়ে বললে, জাপানে মেনোপজ তেমন বড় কোনো সমস্যা হিসেবে ধরা হয় না। কারণ, জাপানে বয়স্ক নারী বলতে প্রথমেই মনে পড়ে—স্ট্রোকে আক্রান্ত, বিছানায় পড়ে থাকা, প্রস্রাব ধরে রাখতে না পারা আর স্মৃতিভ্রষ্ট বৃদ্ধাদের কথা। অথচ এসব সমস্যা মেনোপজের কারণে হলেও, সেগুলো আলাদা করে মেনোপজ বিষয়ক আলোচনায় আনা হয় না। এই সব কারণে জাপানে মেনোপজ নিয়ে চিকিৎসকরা খুব বেশি গুরুত্ব দেন না। ঠিক যেমনটা আগে আমেরিকায়ও দেখা যেত—প্রায় ২৫ বছর আগে, তখনও মেনোপজকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হতো না।

জাপানের সমাজে নারীরা অনেকদিন ধরে পুরুষদের চেয়ে কম অধিকার পেতেন, বিশেষ করে রাজনীতি ও আইনের দিক থেকে। তারপরও, তাদেরকে কখনো পুরুষদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ভাবা হয়নি। বরং পরিবারে নারীরা ছিলেন এক গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানিত অংশ। বয়স বাড়লেও নারীরা পরিবারে গুরুত্ব হারাতেন না, বরং বয়স বাড়লে তারা পূর্বপুরুষের সম্মানের অংশ হয়ে যেতেন। আগে বার্ধক্য বা বয়স বাড়াকে স্বাভাবিক জিনিস হিসেবে দেখা হতো। এটি কোনো রোগ হিসেবে ভাবা হতো না। ফলে, মধ্যবয়সী নারীদেরকেও সমাজে অস্বাভাবিক বা বিচিত্র মনে করা হতো না। কিন্তু এখন সমাজ ও পরিবারের গঠন বদলে গেছে, কাজের পরিবেশও বদলেছে। তাই অনেক সময় বয়স্ক গৃহিণীদের সমাজে "ভিন্ন" বা "অদ্ভুত" মনে করা হচ্ছে। এই অবস্থাটা অনেকটা আমেরিকার মতো—২৫ বছর আগে আমেরিকায় মেনোপজ (যখন নারীদের মাসিক বন্ধ হয়ে যায়) নিয়ে অনেক নেতিবাচক কথা হতো। জাপানেও এখন এমন একটি ভাবনা তৈরি হয়েছে।

জাপানিরা নিজেদের আলাদা ও গর্বিত জাতি হিসেবে ভাবতে পছন্দ করে। আগে তারা নিজেদের তুলনা করত চীন বা অন্য বিদেশিদের সঙ্গে। কিন্তু এখন তারা নিজেরা নিজেদের তুলনা করছে পাশ্চাত্য বা পশ্চিমা দেশের (বিশেষ করে আমেরিকা) সঙ্গে। তারা ভাবছে, পশ্চিমা সমাজে মানুষ অনেক বেশি ব্যক্তিগত হয়ে গেছে, আর এতে পারিবারিক বন্ধন নষ্ট হচ্ছে। এই ভাবনা থেকেই জাপানিরা এখন নিজেদের সমাজে পরিবর্তনকে ভয় পাচ্ছে। এই ভয় ও ভাবনা থেকেই, এখন জাপানে মধ্যবয়সী নারীদের নিয়ে এক ধরনের নেতিবাচক কথা ছড়ানো হয়।

বলা হয়, তারা আগের মতো "ভদ্র, নিয়ন্ত্রিত" নারী নন। এই কারণে তাদেরকে সমাজের জন্য "সমস্যা" হিসেবে দেখা হচ্ছে। যদিও এটা কোনো শারীরিক বা চিকিৎসার বিষয় নয়, এটা আসলে সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ফল। আগে নারীদের বয়স বাড়লে সম্মান বাড়ত, এখন বয়স বাড়লে অনেক নারীকেই সমাজ "ভিন্ন" মনে করছে। এটা জাপান ও আমেরিকা—দুই দেশেই এক ধরনের সমস্যা হয়ে উঠেছে।

জাপান ও উত্তর আমেরিকার সমাজে নারীদের বার্ধক্য (বয়স বৃদ্ধি) নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন হলেও, কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। উত্তর আমেরিকায় নারীর বয়স বাড়া মানেই যেন একধরনের বিপদ। মেনোপজ বা মাসিক বন্ধ হওয়া—যা একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া—তাকে রোগের মতো ভয় দেখিয়ে উপস্থাপন করা হয়। এই বয়সে নারীদের বলা হয় নিজেদের শরীর ফিট রাখতে, সুস্থ থাকতে, যেন বার্ধক্য মানেই দুর্বলতা নয়। ফলে নারীরা নিজেদের শরীর নিয়ে চিন্তিত থাকে, সমাজের চোখে 'সঠিক নারী' হবার চাপ তাদের ওপর সবসময় কাজ করে। তাদের যে নিজস্ব মানসিক বা শারীরিক অভিজ্ঞতা থাকে, তা গুরুত্ব পায় না; বরং সেটাকে ভুল বা অপ্রাসঙ্গিক হিসেবে দেখা হয়। অনেক নারী পরিবারে তাদের বাবা-মা বা স্বামীপক্ষের বৃদ্ধদের দেখাশোনা করেন, তবুও সেই পরিশ্রম সমাজে তেমন স্বীকৃতি পায় না। অন্যদিকে, জাপানে বার্ধক্যকে এতটা ভয় বা রোগ হিসেবে দেখা হয় না, তবে সেখানে নারীদের অন্য ধরনের চাপের মধ্যে পড়তে হয়। মধ্যবয়সী নারীদের ওপর বয়স্ক মা-বাবা বা শ্বশুর-শাশুড়ির দেখভালের দায়িত্ব সামাজিকভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়। তাদের ব্যক্তিগত শারীরিক অসুস্থতা বা কষ্ট প্রায়ই উপেক্ষিত হয়, কারণ সমাজ চায় তারা নিয়ন্ত্রিতভাবে, আত্মসংযমের সঙ্গে, সবার সেবা করুক। জাপানে নারীদের শুধুমাত্র তাদের শারীরিক গঠন দিয়ে নয়, বরং তারা কতটা কর্তব্যপরায়ণ, সহনশীল, এবং আত্মনিয়ন্ত্রিত—এই আচরণ দিয়েও বিচার করা হয়। দুই সমাজেই দেখা যায়, নারীদের একরকম সামাজিক ছাঁচে ফেলা হয়—তাদের আলাদা ব্যক্তিত্ব, অনুভব বা পার্থক্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। নারীরা এইসব চাপ ও আদর্শের বিরুদ্ধে নিজেদের মতো করে প্রতিরোধ করে, ব্যঙ্গ করে বা উপেক্ষা করে বেঁচে থাকার পথ খুঁজে নেয়, কিন্তু সমাজ সেই প্রতিরোধকে স্বীকৃতি দেয় না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই আলোচনায় পুরুষদের বার্ধক্য, তাদের শরীরের দুর্বলতা বা দায়িত্বের কথা প্রায় নেই বললেই চলে। পুরুষদের অসুস্থতা বা দায়িত্বহীনতা যেন সমাজের চোখে পড়ে না—তারা

একপ্রকার অদৃশ্য হয়ে থাকে। অথচ নারীদের নিয়েই সব আলোচনা, সব দুশ্চিন্তা, সব নিয়ন্ত্রণ। প্রশ্ন হলো—কেন শুধুই নারীরাই সমাজের নজরদারির লক্ষ্য, আর পুরুষরা নয়? এই প্রশ্নটাই এখনও আমাদের সমাজে গুরুত্ব পায় না। এটি যেন এক কালো রহস্যের বাক্স—যেটি আমরা কেউ এখনো খোলার সাহস করিনি।

মার্গারেট লক তার প্রবন্ধে স্পষ্টভাবে উঠে আসে যে নারীর দেহ এবং তার জীবনের মধ্যপর্যায়ের রূপান্তর—বিশেষ করে মেনোপজ—শুধু একটি জৈবিক ঘটনা নয়, বরং এটি একটি সামাজিকভাবে নির্মিত এবং সাংস্কৃতিকভাবে অর্থবহ অভিজ্ঞতা। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় চিকিৎসাশাস্ত্র নারীর এই জীবনধারাকে ক্রমবর্ধমান হারে চিকিৎসাগত ব্যবস্থাপনার অধীন নিয়ে এসেছে। ফলে নারীর দেহ হয়ে উঠেছে একটি রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিতর্কের কেন্দ্রস্থল।লেখক দেখিয়েছেন, নারীর দেহে চিকিৎসা প্রযুক্তির প্রয়োগ শুধু চিকিৎসাশাস্ত্রের অভ্যন্তরীণ প্রয়াস নয়, বরং এটি বৃহত্তর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও জ্ঞান উৎপাদনের প্রক্রিয়ার অংশ। তবে নারীরা এ প্রক্রিয়ায় নিঃক্রিয় নন; বরং তারা নিজেদের অভিজ্ঞতা, অবস্থান ও প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে এই আধিপত্যবাদী ভাষ্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন।জাপান ও উত্তর আমেরিকার তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে লেখক তুলে ধরেছেন, স্থান-কাল এবং সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত ভেদে মেনোপজ সংক্রান্ত অর্থ ও অভিজ্ঞতা ভিন্নতর হয়ে ওঠে। ফলে নারীর মধ্যজীবন ও বার্ধক্যকে বোঝার জন্য একমাত্রিক, চিকিৎসা-নির্ভর ভাষ্য যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন একটি বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, যা নারী-অভিজ্ঞতা, স্থানীয় জ্ঞান এবং সামাজিক বাস্তবতাকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় আনে।

অতএব, এই প্রবন্ধ আমাদের উদ্বুদ্ধ করে নারীর স্বাস্থ্য ও জীবনের পরিবর্তনগুলিকে একটি অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ, সমাজ-সচেতন ও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে পুনরায় ভাবতে।

**তথ্যপুঞ্জিঃ**


1. Bell, A. (1987). Menopause and the medicalization of women's lives. In S. Wolf (Ed.), Women and health: A feminist perspective (pp. 123–138). Harper & Row.

2. Foucault, M. (1979). Discipline and punish: The birth of the prison. Pantheon Books.

3. Foucault, M. (1979). The history of sexuality, Volume 1: An introduction (R. Hurley, Trans.). Vintage Books.

4. Foucault, M. (1973). The birth of the clinic: An archaeology of medical perception. Vintage Books.

5. Greenblatt, R., & Teran, A. (1987). ৫.World Health Organization, 1981, p. 42

6. Greenhalgh, T. (1992). The medicalization of women's lives. The Lancet, 340(8821), 419–421.

7. Gramsci, A. (1971). Selections from the Prison notebooks of Antonio Gramsci. International Publishers.

8. Journal of the American Medical Association (1975).

9. Kaufert, P., & McKinlay, S. (1985).

10. Kaufert, P. A. (1988). Menopause and the medicalization of women's health. In R. J. Moore & L. R. Walden (Eds.), The women's health movement: A decade of change (pp. 57–66). University of Illinois Press. https://doi.org/10.1525/maq.1988.2.1.02a00040

11. Kaufert, P. A. (1988). Menopause as disease or life transition? Medical Anthropology Quarterly, 2(1), 57–66. https://doi.org/10.1525/maq.1988.2.1.02a00040

12. Lock, M. (1993). Encounters with aging: Mythologies of menopause in Japan and North America. University of California Press.

13.New England Journal of Medicine (1975).

**প্রশ্নঃ**

১।'নারীর দেহ হয়ে উঠেছে বিতর্কের প্রধান ক্ষেত্র' এই উক্তিটি নারীবাদী চিকিৎসা-নৃতত্ত্বের প্রেক্ষাপটে কীভাবে বিশ্লেষণ করা যায়?

২।মার্গারেট লক কীভাবে 'menopause'কে কেবল শারীরিক পরিবর্তন নয়, বরং একটি সাংস্কৃতিক নির্মাণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন?